কিংবদন্তির কথা বলছি

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. এর জীবনকথা

কিংবদন্তির কথা বলছি

আহমাদ সাব্বির

নাশাত

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. এর জীবনকথা
কিংবদন্তির কথা বলছি
আহমাদ সাব্বির

প্রথমপ্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৯
প্রথমসংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ইসলামি টাওয়ার
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : কায়েস শরীফ
প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত
মূল্য : ১৮০ (একশ আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

অর্পণ

মুফতি শরিফুল ইসলাম
(জুরাইন হুজুর)
যার হাতে সঁপেছি জীবন

ভূমিকার বদলে

মৃত ধূসর প্রাণহীন ঘাসের মাঠের ভেতর দৈবাৎ মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে কোনো শিশু অশ্বত্থ। ক্রমে ক্রমে সেই শিশু অশ্বত্থ বড় হয়। সময়ে হয়ে ওঠে বিশাল মহীরুহ। পথ চলতে ক্লান্ত পথিক খানিক জিরোয় তার ছায়ায়; প্রাণশক্তি হৃদয়ে শুষে নিয়ে ছুটে চলে ফের সম্মুখে। বহু দূর দিগন্ত থেকে পথহারা মুসাফির বিশাল দেহী অশ্বত্থের অস্তিত্বে ভরসা খুঁজে নেয়—এই তো, গন্তব্য অদূরেই।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহিমাহুল্লাহ ছিলেন হতভাগ্য উম্মাহর তেমনই এক মহীরুহ। অজ্ঞতার রোদ্দুরে পোড়া উম্মাহর জীবনে তিনি শীতল সুনিবিড় ছায়া হয়ে উঠেছিলেন, যেন পেলব স্নিগ্ধ ছায়াদায়ী বিশাল অশ্বত্থ। ছিলেন পথহারা মুসাফিরের দরদি রাহবার।

যে আলোয় ভাস্বর জীবন তিনি যাপন করে গেছেন, আমাদের বিশ্বাস আজও তার মাঝে চলার প্রেরণা খুঁজে পাবে ভবিষ্যৎ সাফল্যের অভিযাত্রী। আর সেই বিশ্বাস থেকেই এই গ্রন্থের জন্ম।

গ্রন্থটির বুননে আমি মাওলানা খানের আত্মজীবনী, বিভিন্ন সময়ে নানানজনকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁর স্মরণে বিভিন্ন পত্রিকার স্মরণসংখ্যা ও নানান মানুষের শরণ নিয়েছি। এসব এবং সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আরও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ মাওলানা খানের ছোট পুত্র আহমদ বদরুদ্দীন খান ও জীবন্তিকা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় এহসান সিরাজ'র প্রতি। তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা কাজটি শেষ করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে দারুণভাবে।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের মতন এমন অব্যক্ত আনন্দের মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি—যাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ স্নেহ ভালোবাসা দোয়া ও সহযোগিতার ডানায় ভর করে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। পরম করুণাময় সর্বদা তাদের উপর অবিরাম করুণাধারা অব্যাহত রাখুক—কামনা করি।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি নাশাত পাবলিকেশনের প্রাজ্ঞ স্বত্বাধিকারী জনাব আহসান ইলিয়াসকে। তিনি একজন নবীন লেখকের প্রতি যে মমত্বপূর্ণ আস্থা দেখিয়েছেন, তা আমাকে ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

তবে একটি কথা না বললেই নয়—যে বিস্তৃত জীবন ছিল মাওলানা খানের তাকে মাত্র একশ' ষাট পৃষ্ঠার মধ্যে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। আমি আমার মতো করে তাঁর জীবনের কিছু দিক তুলে ধরেছি মাত্র। নতুন প্রজন্মের কাছে মাওলানা খানের জীবন ও কর্মকে পরিচিত করে তুলবার এ আমার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার

এ কাজ দেখে কেউ যদি তাঁকে নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার থিসিস রচনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন—এবং সেটা তার জীবন ও কর্মের দাবীও বটে—তবে সেটাকে আমার স্বার্থকতা ভেবে নেব। অজস্র ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনারা ভালোবাসার সাথেই গ্রহণ করবেন—এ আমার বিশ্বাস।

সর্বোপরি, 'কিংবদন্তির কথা বলছি' যাদের জন্য, তাদের কাছে যদি ভালো লাগে, তারা যদি মাওলানা খানের প্রোজ্জ্বল জীবন থেকে আলো গ্রহণে উৎসাহী হন তাতেই আমার আনন্দ।

আপনাদের দোয়ায় আমাকে শামিল রাখবেন; সকলে সুখী থাকবেন—প্রত্যাশা

ওয়াস সালাম
আহমাদ সাব্বির
২৭, ১০, ২০১৯
ফরিদাবাদ, ঢাকা।

সময় গোধূলি।

দিনভর আলো বিলিয়ে ক্লান্ত সূর্যটা ডুবে গেছে খানিক আগে। লাল রঙ গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমাকাশের সারা গায়ে। ঘনায়মান সন্ধ্যার নিচে ব্যস্ত মানুষের চোখে-মুখে ঘরে ফেরার তাড়া; ভীষণ তাড়া। কেবল তাড়া নেই তিনজন মানুষের। ক'দিন যাবৎ কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের আইসিইউ'র ঠিক উপরতলার ঘরটাই তাদের বাড়িঘর, তাদের কর্মস্থল; সব। এই ক'দিন তারা সময় করে খাওয়া ভুলে আছে, নিয়ম করে নাওয়া ভুলে আছে; ভুলে আছে জীবনের নিয়মিত-অনিয়মিত সব আয়োজন। কেবল ভুলে থাকতে পারছে না উৎকণ্ঠিত মন।

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান, মোর্তুজা বশিরুদ্দীন খান, আহমদ বদরুদ্দীন খান—এই তিনজনই কেবল নয়; দেশের আনাচ-কানাচ থেকে প্রতিদিন শত মানুষ এসে ভিড় করছে এগারোতলার নীল পর্দাঘেরা ঘরটার সামনে। তারা দেখতে চায় তাঁকে একটিবার; আবেগাপ্লুত হৃদয়ে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়—ভালো আছেন তিনি, বেঁচে আছেন; কিন্তু কাছের যারা, তাদের অজানা নয়—কেমন বেঁচে আছেন তিনি, কতটুকু ভালো আছেন!

আইসিইউ হলেও তাঁকে থাকতে হচ্ছে একাধিক রোগীর সাথে, যাদের অবস্থা তাঁর চেয়েও বিপন্ন। এতজন মৃত্যুপথযাত্রীর মাঝে বেঁচে থাকছেন তিনি—যে কারণে অস্থির থাকেন কিছুটা।

প্রথম যেদিন তাঁকে আনা হলো আইসিইউতে তার বোধ সম্পূর্ণ সচল ছিল। শরীরজুড়ে অক্টোপাসের মতো পাইপের জটিল বাঁধন: নড়াচড়া করতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, তবে বুঝতে পারেন ঠিকঠাক; সবকিছু। দেখতে পান—আশপাশের রোগীদের উপর কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে! সময়ে সময়ে বড্ড অস্থির হয়ে যেতেন। কাউকে পেলেই কাতর হয়ে পড়তেন। ইঙ্গিতে বলতেন হাতের বাঁধন খুলে দিতে।

ছটফট করতেন দেখে খুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতের বাঁধন। তিনি কাগজে লিখে দেন—'হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। তোমরা আমাকে খুলে দাও। বাসায় নিয়ে চলো।'

জুমআর দিন এলে তাঁর কাতরতা উপস্থিত সকলের ভেতর হাহাকার তৈরি করে দিত। তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন জুমআর জামাতে শামিল হওয়ার জন্য। তাঁকে বোঝাতেন তাঁর সন্তানেরা—'আল্লাহ স্বয়ং রহিত করে দিয়েছেন আপনার জুমআ।

এত অস্থির হবেন না।’ অবিশ্বাসী নয়নে তিনি কেবল চেয়ে থাকেন সন্তানদের দিকে। কিছুই বুঝতে চান না। বার বার শুধু বলতেন—তাবৎ বাঁধন খুলে দিতে।

নির্লিপ্ত চিকিৎসকেরা বলত—লাইফ সাপোর্ট খুলে দিলে বাঁচানো যাবে না তাঁকে। অথচ তারা আদৌ বলত না—এভাবে কষ্ট দিয়ে, লাইফ সাপোর্টে বেঁধে রেখে মৃত্যু আটকে দেওয়া যাবে কি-না!

প্রায় চল্লিশ দিন হলো তিনি লাইফ সাপোর্টে আছেন। অসুস্থতা তাঁর অনেক দিনের। কিডনিতে ব্যাধি, শ্বাসকষ্ট এবং বার্ধক্যজনিত নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন সেই কবেই; গোপন কোনো অভিমান কি-না! অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেন। যে মানুষটি কিছুকাল আগেও ছুটে বেড়িয়েছেন সারাদেশ, সেই মানুষটি গত কয়েক বছর একটিও সভা-সমাবেশে যোগ দেননি। দু’-একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন যদিওবা, পুলিশি বাঁধার কারণে যেতে পারেননি।

অবশ্য বিগত বছরকার সময়টা ঘরের চেয়ে হাসপাতালেই তাঁকে কাটাতে হয়েছে বেশি। কখনও শমরিতা, কখনও বারডেম আবার কখনও সেন্ট্রাল হসপিটাল। এভাবেই দিন-সপ্তাহ-মাসগুলো কেটে গেছে তাঁর।

সালটা দুই হাজার ষোলো।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ভর্তি করা হলো বারডেম হসপিটালে। অবস্থা গুরুতর দেখে চিকিৎসকের পরামর্শে দ্রুত আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হলো তাঁকে। সেখানে মাস খানেক চিকিৎসা গ্রহণ করলেন। অবস্থার উন্নতি ঘটলো অনেকটা। হাসি মুখ ফিরে এলো শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

বারডেমের আইসিইউ থেকে বের হয়ে আরেকটু সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরবেন—এই আশায় ভর্তি করা হলো তাঁকে কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে।

কিন্তু কে জানতো—সেখানে ভর্তির পর চেনা চিত্রপট এমন অকল্পনীয়ভাবে বদলে যেতে শুরু করবে! ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের চিকিৎসা-ব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে আশঙ্কাজনকভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকল। ১৭ মে মারাত্মক শ্বাসকষ্ট শুরু হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হলো।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ভেবে চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নিলেন গলায় অপারেশন করে ফুসফুসে একটি নল স্থাপন করবেন। অপারেশন সফল হলো ঠিকই; কিন্তু কিছুদিন পর সেখানে রক্তক্ষরণ দেখা দিল। পরবর্তীতে তাঁকে যখন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে ল্যাবএইডে নেওয়া হয়েছিল, সেখানকার চিকিৎসকেরা বলেছিলেন—কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস গ্রহণের জন্য গলার অপারেশনটার প্রয়োজন ছিল না। এই অপারেশন তাঁকে আরও দুর্বল করে ফেলেছে।

সেদিন পঁচিশে জুন।

নীল পর্দাঘেরা ঘরে ব্যথিত জীবন পার করছেন তিনি। তাঁর তিন সন্তান পালাক্রমে বাবার সেবায় নিয়োজিত। ছোট ছেলে আহমদ বদরুদ্দীন খানকে রেখে বড় দুই ছেলে হোটেল সোনারগাঁয়ের উদ্দেশে হসপিটাল ছাড়লেন। সৌদি অ্যাম্বাসি ইফতার পার্টি দিয়েছে। তাদের গন্তব্য সেখানে। ইতোমধ্যে আসরের নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারা নামাজ পড়েই বেরোবেন—মনস্থির করে হসপিটালের মসজিদে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এদিকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ পড়তেই উৎকণ্ঠিত আহমদ বদরুদ্দীন খানের শ্বাস যেন গলার কাছে এসে আটকে পড়ে। তিনি দেখেন বিপি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামছে। তিনি দৌড়ে গেলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক এসে জানালেন অবস্থা তিনি ভালো মনে করছেন না। আহমদ বদরুদ্দীন খান অনুচ্চ স্বরে সুরা ইয়াসিনের তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। অকস্মাৎ মনে পড়লো তার বড় দুই ভাইয়ের কথা। ছুটে গেলেন নামাজঘরের দিকে। তার কেন যেন মনে হয়েছিল বড় ভাইদের তিনি সেখানেই পেয়ে যাবেন। হলোও তাই। তিনি গিয়ে দেখেন দুজন আসরের জামাতে শামিল। বড়ভাই কাতারের পেছন দিকে ছিলেন। তিনি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জানালেন চিকিৎসকের উদ্বেগের কথা। বড়ভাই নিজের বোধ ধরে রাখতে পারলেন না। নামাজ ছেড়ে ছুটে এলেন বাবার রুমে। ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে বসে পড়লেন বাবার শয্যাপাশে। ছোট ছেলে আহমদ বদরুদ্দীন খান গুনগুন করে পাঠ করে চলেছেন সুরা ইয়াসিন। সুরা সম্পূর্ণ হতে তখনও চার আয়াত বাকি। দেখেন—থমকে গেছে প্রকৃতি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সাগরসম প্রজ্ঞা বুকে নিয়ে এক অনাস্বাদিত পৃথিবী। মুহূর্তেই অন্ধকার নেমে এলো তাঁকে ঘিরে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর চোখ-মুখজুড়ে। অথচ কি নির্বিকার তিনি! হাসছেন যেন! যেনবা মিলনের অনাবিল সুখ মুঠো ভরে তুলে নিয়েছেন মাত্র।

একটি জাহাজ ছেড়ে গেল।

এবং অবাক হয়ে সবাই দেখলো—দিনটি রমজানের উনিশতম দিন। এমন একটি দিনেই তো তিনি বিদায় নিতে চেয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি কাছের মানুষদের বলে আসছেন—‘দেখে নিও, রমজান মাসেই আমার মৃত্যু হবে!’ যখন অসুস্থ হয়ে হসপিটালে, এদিকে রমজান মাসও চলছে; তিনি সবাইকে ডেকে বলতেন—‘এটাই কিন্তু আমার শেষ রমজান!’

নাতি-নাতনিরাও রসিকতা করত সময়ে সময়ে—‘এমন তো তুমি আগেও বলেছো!’

তাদের কথা শুনে তিনি খানিক অভিমানী হয়ে উঠতেন। শিশুর মতো গাল ফুলিয়ে বলতেন—‘আরে না, আমি সত্যি বলছি। কোনো এক রোজার দিনেই সামনে এসে দাঁড়াবে আমার মৃত্যুর ফেরেশতা। রোজাদার অবস্থায় আমি গিয়ে দাঁড়াবো আমার প্রিয়তমের সামনে।’

এ কথা বলতেন আর বিহ্বলতার এক উজ্জ্বলতর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ত তাঁর চোখে-মুখে। ঐশ্বরিক আনন্দে হেসে উঠতো তাঁর রাঙা চিবুক।

তবে বুকের গহীনে কিছুটা কি দুঃখ নিয়ে গেলেন!

রোজাদার অবস্থায় যে যেতে পারলেন তাঁর রবের সান্নিধ্যে!

এটা নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। প্রতিদিনই তিনি ছেলেদের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন—‘আমি রোজা রাখতে চাই। ব্যবস্থা করো!’

ছেলেরা সান্ত্বনা দিতে বলত—‘তুমি তো একপ্রকার রোজাই রাখছো! সেহেরির সময় তোমাকে একটু জমজম পান করানো হয়। আবার ইফতারিতে সেই জমজম। এর মধ্যে তো তোমাকে কিছুই দেওয়া হয় না। তুমি তো রোজাই রাখছো!’

কে জানে তিনি সান্ত্বনা পেতেন কি-না! তবে এসব কথা শুনে শান্ত হতেন ক্ষণিকের জন্য। ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত তিনি আলতো করে বুজে রাখতেন প্রবীণ আঁখি।

তিনি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহিমাহুল্লাহ।

আলোয় ভাস্বর এক জীবন তাঁর। ‘কিংবদন্তির কথা বলছি’ সেই আলোকিত জীবনেরই গল্প। যে গল্পের শুরু তাঁর প্রস্থানের দিন থেকে প্রায় আশি বছর আগে।

সেদিন শুক্রবার। ১৯৩৫ সালের ১৯ এপ্রিল।

মসজিদগামী নামাজিদের কানে সুললিত কণ্ঠের আজান ভেসে আসে। তারা ভালো করে কান পেতে বুঝতে পারে—এ আওয়াজ মুন্সি আবদুল হামিদের কণ্ঠ থেকেই ভেসে আসছে। সে ছাড়া এ তল্লাটে দ্বিতীয় কেউ নেই—এত মিষ্টি সুরে আজান দেবে। নামাজিদের তখন অবাক হওয়ার পালা। মুন্সি আবদুল হামিদের আজান শুনেই তো তারা জুমআর নামাজ আদায় করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছে। তা হলে আজানের এ পুনরাবৃত্তি কীসের জন্য! নামাজিদের অনেকে ভাবে—প্রথমবার হয়তোবা তারা ভুল শুনেছে। একটু সচেতন যারা, তারা বলে : না, এবারের আজান তো মসজিদের দিক থেকে আসছে না! আসছে মুন্সি আবদুল হামিদের বাড়ি থেকে। আমাদের কোনো ভুল হচ্ছে না। তখন উপস্থিত সবার খেয়াল হয়—আরে, তাই তো! এ আজান তো মুন্সি সাহেবের বাড়ির দিক থেকে আসছে। ‘চলেন, এগিয়ে দেখি ঘটনা কী!’

নামাজিদের ছোট্ট দলটি মুন্সি আবদুল হামিদ সাহেবের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। বাড়ির সামনে এসে তাদেরই একজন প্রবীণ সংবাদ আনার জন্য ভেতর-বাড়িতে আওয়াজ পাঠালেন। সে আওয়াজ শুনে মুন্সি আবদুল হামিদ নিজেই বের হয়ে এলেন। নামাজিদের চোখে-মুখে কৌতূহল। সেই প্রবীণ মানুষটি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললেন—‘তা, মুন্সি সাহেব, আজান শুনলাম মনে হচ্ছে! কী সমাচার!’

মুন্সি আবদুল হামিদ স্মিত হাসেন; সবার কৌতূহল মেটাতে বলেন—কিছু সময় আগেই তার মেয়ের কোল আলো করে এক পুত্রসন্তান দুনিয়াতে এসেছে। এ সংবাদ শুনে নামাজিদের ছোট্ট দলটি একসাথে বলে উঠল—‘আলহামদুলিল্লাহ!’

নামাজিদের একজন জিজ্ঞেস করে বসল—‘তা, নাতির নাম রেখেছেন কী?’

মুহিউদ্দীন।

উপস্থিত নামাজিরা খুশি প্রকাশ করেন—‘মাশাআল্লাহ! খুবই উমদা নাম।’

মুন্সি আবদুল হামিদ এবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন—‘মেয়ে আর জামাই নাম আগেই ঠিক করে রেখেছিল।’

এবার নামাজিদের একজন মুন্সি আবদুল হামিদের কাছে জানতে চান—‘আচ্ছা, মুন্সি সাহেব, এই যে সন্তান দুনিয়াতে আসলে আমরা আজান দিই, এতে ফায়দাটা কী!’

তার জিজ্ঞাসাতে কৌতূহলের সুর।

প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করে। একটু মুরুব্বি যারা ছিলেন, তারা আবার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে লাগলেন। মুন্সি সাহেব দেখলেন—যে যার মতো করে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। তখন তিনি সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'আসলে নবজাতকের কানে আজান দেওয়ার অনেক ফায়দার কথা বিভিন্ন কিতাবে লেখা আছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তাঁর এক কিতাবে কী লিখেছেন, আপনাদের বলি, শোনেন।'

নামাজিরা মুন্সি আবদুল হামিদের প্রতি মনোযোগী হয়ে দাঁড়ালেন। মুন্সি আবদুল হামিদ বলে চলেন—'মাওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন—নবজাতকের কানে আজান দেওয়ার তাৎপর্য অনেক। যেমন :

১. শিশুটি যেন পৃথিবীর আলো-বাতাসের সাথে পরিচিত হওয়ার আগেই আল্লাহর নামের মহান আহ্বানের সাথে পরিচিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।
২. হাদিস শরিফে আছে—আজানের আওয়াজ শুনলে শয়তান বড় বেহাল অবস্থায় পলায়ন করে। তাই নবজাতককে শয়তানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহর নাম সশব্দে উচ্চারণ করা।
৩. জন্মের সাথে সাথে নবজাতকের কানে আজানের শব্দ পৌঁছে দেওয়ার এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, বাবা, শুনে রাখ, তুমি যে আজান শুনছ, এ আজান শোনার পর এখনই তোমাকে কোনো নামাজ পড়তে হবে না। তবে কিছুকাল পরেই তোমার জন্য এক নামাজ অপেক্ষা করছে। সে নামাজের জন্য আজান দেওয়া হবে না। আজানটি আজই দিয়ে রাখা হলো। আজান শোনার পর একজন নামাজি যেভাবে কাজকর্ম দ্রুত গুছিয়ে নামাজে অংশগ্রহণের জন্য ছুটে যায় ঠিক সেভাবে তোমাকে জীবনের শেষ নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। গাফেল হয়ে দুনিয়ার মোহ-মায়ায় ডুবে থাকলে চলবে না।

মুন্সি আবদুল হামিদ তার কথা শেষ করে থামলেন। উপস্থিত নামাজিদের চেহারায় খুশির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়েছে। নবজাতকের কানে আজান দিতে হয় এটা তারা জানতো। কিন্তু এই আজানের পেছনে যে এত সুন্দর উদ্দেশ্য আছে তা তারা জানতো না। মুন্সি আবদুল হামিদ কত সুন্দর করে বিষয়টা আজ তাদের বুঝিয়ে দিলেন!

একটু থেমে মুন্সি আবদুল হামিদ আবার মুখ খোলেন—'আমার নাতির জন্য দোয়া করবেন সবাই। আল্লাহ যেন তাকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর মতো বড় আলেম বানিয়ে দেন।'

মুরুব্বি ধরনের একজন বলে উঠলেন—'এটা কী কথা! এভাবে কি দোয়া হয়! বড় খানার আয়োজন করেন। বাড়িতে গিয়ে আমাদের নাতির জন্য দোয়া করে আসি।'

মুরুব্বির কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। বুঝতে পারে—মুরুব্বি রসিকতা করে বলছেন।

মুন্সি আবদুল হামিদ বলেন—‘হবে হবে। ইনশাআল্লাহ, বড় করে নাতির আকিকা দেওয়া হবে।’

জুমআর নামাজের সময় হয়ে আসছিল। মুন্সি আবদুল হামিদ নামাজিদের বলেন—‘চলেন, মসজিদের দিকে যাই। নামাজের আর বেশি বাকি নাই।’

মুন্সি আবদুল হামিদকে সামনে রেখে নামাজিদের ছোট্ট দলটি মসজিদের উদ্দেশে চলতে শুরু করল।

মুহিউদ্দীন খানের জন্ম হয় কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ছয়চির গ্রামে, তার নানার বাড়িতে। তার নানা মুন্সি আবদুল হামিদ একজন রুচিবান মানুষ ছিলেন। আলেম ছিলেন না; তবে আলেমদের সাথে ছিল তার হৃদয়ের সম্পর্ক। খুবই সুরেলা কণ্ঠে আজান দিতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ তার তেলাওয়াত শুনতো।

মুহিউদ্দীন খানের নানাজান মুন্সি আবদুল হামিদের একটি গুণ ছিল—তিনি খেতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বিশেষ করে মাঝেমধ্যেই আলেমদের নিয়ে জমকালো খানাপিনার আয়োজন ছিল তার খুব পছন্দের। কেবল আলেমই নয়; তার বাড়ির দস্তরখান পরিচিত, অপরিচিত, আধা পরিচিত সকলের জন্যই ছিল অবারিত। যে কারণে তার খাদ্যরুচির প্রশংসা ছয়চির গ্রামের সীমানা পেরিয়ে আশপাশের দশ গ্রাম অব্দি ছড়িয়ে পড়েছিল।

এমন মেহমান-নেওয়াজ যিনি, সেই মুন্সি আবদুল হামিদ তার আদরের নাতির দুনিয়ায় আগমনের আনন্দে কি কিছুই করবেন না! তা কি হয়! মুন্সি আবদুল হামিদ জমকালোভাবে নাতির আকিকা দিলেন। ধনী-গরিব, আলেম-বেআলেম সকলে মুন্সি আবদুল হামিদের আন্তরিক আপ্যায়ন গ্রহণ করেন এবং যাকে ঘিরে এ আয়োজন, সেই ছোট্ট মুহিউদ্দীনের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেন। সবাই আল্লাহ তায়ালার কাছে শিশু মুহিউদ্দীনের জন্য কামনা করলেন—যেন আল্লাহ তাকে একজন বড় আলেম বানিয়ে দেন; সেই সময়কার বিখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর মতো।

এতগুলো ভালো মানুষের দোয়া কি বিফলে যেতে পারে!

অসংখ্য মানুষের দোয়া ভালোবাসা আর শুভ কামনা সাথে নিয়ে ছোট্ট মুহিউদ্দীন তাঁর মায়ের সাথে দাদুর বাড়িতে ফিরে এলো। দাদুর বাড়ি বেশি দূরে ছিল না। ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারেই পিড়লগঞ্জের নীলকুঠি গ্রামে। নানাজানের সাথে দাদাজান তৈয়ব উদ্দীন খাঁর বেশ মিল ছিল। দাদাজানও আলেমদের ভালোবাসতেন হৃদয় নিংড়ে। সবসময় তাদের সাথে পরামর্শ করে চলতেন। দাদাজান ইমামতি করতেন বাড়ির পাশের জুম্মা মসজিদে। তবে দাদাজান তৈয়ব উদ্দীন খাঁর একটা অন্য ধরনের শখ ছিল। প্রায়ই তিনি দেশি-বিদেশি আলেমদের দাওয়াত করে ওয়াজ মাহফিল এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তার একটা ইতিবাচক প্রভাব গ্রামের মানুষের উপর পড়েছিল। তবে দাদাজানকে ছোট্ট মুহিউদ্দীন বেশিদিন পায়নি। মুহিউদ্দীন যখন একদম ছোট, এক বছরের মতো বয়স, তখন তার দাদাজান তৈয়ব উদ্দীন খাঁ ইনতেকাল করেন।

দাদাজান তৈয়ব উদ্দীন খাঁ মারা যাওয়ার অল্প ক'দিন পরের একটি গল্প বলি। গল্পটা খানিক রহস্য জড়ানো।

মুহিউদ্দীন খানের দাদাবাড়ির এলাকাতে একজন দরবেশ থাকতেন: হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কী। মানুষকে শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বাংলা অঞ্চলে দীনি পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সুদূর মক্কা থেকে তিনি এ অঞ্চলে হিজরত করে এসেছিলেন। কেবল তিনি নন; মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ও সঠিক ইবাদত-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় বহু অলি, দরবেশ, গাউস, কুতুব, আলেম এ দেশে হিজরত করে আসেন। কিন্তু একটা দুঃখের কথা কী, তাদের জীবন এবং দীনের জন্য তাদের যে ত্যাগ, তা আমরা কেউ সংরক্ষণ করে রাখিনি। যার ফলে তাদের জীবন ও কর্মপদ্ধতির প্রায় সবই আমাদের অজানা। এমনকি অসংখ্য আল্লাহওয়ালার নামটি পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না। আমাদের অযত্ন অবহেলা ও মানসিক দৈন্যের কারণে সবই যেন তলিয়ে গেছে ইতিহাসের অন্ধকারে।

এখনই সময়—একদল তরুণ মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে, যারা এইসব ত্যাগী ও মহান দায়ির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানবে। হাজার বছরের ইতিহাসের উপর যে ধুলো জমে আছে, তা সরিয়ে ফেলে যাদের ত্যাগ, কোরবানি ও আল্লাহমুখিতার বদৌলতে আমরা ইসলামের মতো মহান নেয়ামত পেয়েছি, তাদের জীবন ও কর্ম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে। কাজটি কঠিন, সন্দেহ

নেই; তবে অসম্ভবও নয়। যারা নিজেদের পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানে না, তারা কখনোই পৃথিবীর বুকে সম্মানের সাথে টিকে থাকতে পারে না।

বলছিলাম হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কীর কথা।

মানুষকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শেখানোর জন্য তিনি সেই সুদূর মক্কা থেকে এই বাংলায় চলে এসেছিলেন। দীনের জন্য কত বড় ছিল তাদের আত্মত্যাগ, যা আজ আমাদের সমাজে একদমই অকল্পনীয়!

এই হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কীর যাতায়াত ছিল সর্বত্র। দরবেশ মানুষ ছিলেন। সবাই তাই তার খাতির-যত্ন করত খুব। মুহিউদ্দীন খানের দাদিজানের হাতের মাসকলাইয়ের ডাল খুবই সুস্বাদু হতো। এই মাসকলাইয়ের ডাল হাফেজ সাহেবের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রায় তিনি সে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে যেতেন মুহিউদ্দীনের দাদিজানের হাতের মাসকলাইয়ের ডাল খাওয়ার জন্য।

শেষ যে বার হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কী সে বাড়িতে আসেন, মুহিউদ্দীনের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। এবার যাওয়ার সময় তিনি বাড়ির প্রতিটি মানুষের থেকে এক এক করে বিদায় নেন, যা তিনি আগে কখনও করেননি। এবং বিদায়ের সময় বেশ দরাজ কণ্ঠে প্রত্যেককে বলেন, 'বলো, কী চাও আমার কাছে?'

সবাই যার যার পছন্দমতো চাহিদা প্রকাশ করছিল। শেষমেশ ডাক পড়ে মুহিউদ্দীনের আম্মার। তার আম্মা নিয়মতান্ত্রিক পর্দা করতেন। তবু মুহিউদ্দীনের দাদিজানের চাপে বেশ জড়োসড়ো হয়ে হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আবদুল ফাত্তাহ মক্কী তার কাছে জানতে চাইলেন—'বলো, মা, কী চাও তুমি?'

মুহিউদ্দীনের আম্মা হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কীর সামনে ছোট্ট মুহিউদ্দীনকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—'মামা, আপনার এই ছোট্ট ভাইটার জন্য দোয়া করে যান। ও যেন আজীবন দীনের খেদমত করে যেতে পারে।'

কথাগুলো যখন বলছিলেন, আবেগে মুহিউদ্দীনের আম্মার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আম্মার কথা শুনে দরবেশ কিছু সময় চোখ বুজে রইলেন। তারপর থলের ভেতর থেকে একটা খাগড়ার কলম বের করে ছোট্ট মুহিউদ্দীনের কানে গুঁজে দিলেন। আর বললেন—'নাও, মা! কলমজান বুবুর নাতি, আমার নানাভাই, তোমার এই ছেলেকে দিয়ে গেলাম মুক্তাগাছার জমিদারি লিখে।'

সুফি-দরবেশ, আল্লাহওয়ালাদের দোয়া কিন্তু বিফলে যায় না। হাফেজ আবদুল ফাত্তাহ মক্কীর দোয়াও ব্যর্থ হয়নি। সেদিনকার ছোট্ট মুহিউদ্দীন বড় হয়ে ঠিকই জমিদারি অর্জন করেছিল। তবে মুক্তাগাছার নয়; আরও অনেক বড় সাম্রাজ্যের, যে সাম্রাজ্যের কোনো তুল্যমূল্য হয় না।

আদরে সোহাগে ছোট্ট মুহিউদ্দীন বড় হতে থাকল। শরীরের গঠন যেমন বাড়ছিল সেই সাথে তার চিন্তা ও ভাবনার সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জীবন সুন্দর করার জন্য যতগুলো মানবিক উপাদান একজন মানুষের মধ্যে থাকা দরকার, তার অধিকাংশই মুহিউদ্দীন সেই ছোট্ট বয়সেই নিজের মধ্যে ধারণ করতে শুরু করেছিল। আর এই সূচনাটা হয়েছিল তার শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের মাধ্যমে।

একজন সন্তানের প্রথম শিক্ষক তার মা। মায়ের সাহায্যেই একটি শিশু প্রথম পার্থক্য করতে শেখে—কোনটা উচিত আর কোনটা উচিত নয়।। একজন মা-ই সর্বপ্রথম তার সন্তানকে বুঝতে শেখান, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর আর ওটা কল্যাণকর নয়।

মুহিউদ্দীন খানের আম্মাজানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বুঝতে শেখার পর থেকেই তিনি তার আদরের মুহিউদ্দীনকে ভালোমন্দ শেখাতে শুরু করেন। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য দেখিয়ে দিতে থাকেন। ছোট্ট মুহিউদ্দীন বেশ ভালোভাবেই তার আম্মার দেওয়া শিক্ষাগুলো রপ্ত করছিল।

মুহিউদ্দীন খানের পরবর্তী জীবনে যে খোদাভীতি, নবীপ্রেম এবং উন্নত আখলাক তার চরিত্রের অলঙ্কাররূপে দেখা দিয়েছিল, তার বীজ শৈশবেই আম্মাজানের পাঠশালাতে অঙ্কুরিত হয়েছিল। ছোট্ট মুহিউদ্দীনকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের অন্ত ছিল না। অনেক সময় তাকে কোলে শুইয়ে আম্মা গুনগুন করতেন :

শত শত তারা দেখ, দূর না হয় আঁধার
এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার।

সত্যিই তো, রাত হলে আকাশে মিটিমিটি কত তারা জ্বলে ওঠে! কিন্তু সেগুলোতে কি রাতের অন্ধকার দূর হয়? হয় না। অথচ একটি মাত্র চাঁদ, তার কী আলো! সমস্ত অন্ধকার দূর করে ফেলে। আম্মাজান স্বপ্ন দেখতেন, তার মুহিউদ্দীন হবে তেমনই এক চাঁদ। আলোকিত চাঁদ।

রাতে যখন ছোট্ট মুহিউদ্দীন আম্মাজানের গলা জড়িয়ে ঘুমুতে যেত গল্প না শোনা পর্যন্ত তার চোখে ঘুম আসতে চাইতো না। ওই বয়স থেকেই মুহিউদ্দীন ছিল গল্পপাগল। আম্মাজান মুহিউদ্দীনের এই আগ্রহের মূল্যায়ন করতেন। প্রতি রাতেই গল্প শোনাতেন মুহিউদ্দীনকে। কিন্তু বুদ্ধিমতী আম্মা বাঘ, ভালুক, শেয়ালের গল্প শুনিয়ে আদরের সন্তানের মনোবল নষ্ট করতে চাইতেন না। তিনি প্রতি রাতে মুহিউদ্দীনকে এমন গল্প শোনাতে লাগলেন, যাতে তার বুকে সাহস

তৈরি হয়; হৃদয়ে জন্ম নেয় স্বজাতির প্রেম এবং আল্লাহ-রাসুলের দুশমনদের সাথে লড়াইয়ের অদম্য মনোবল।

আম্মাজান ছোট্ট মুহিউদ্দীনকে আমাদের প্রিয়তম নবীজির গল্প শোনাতেন। আত্মত্যাগী সাহাবিদের কথা বলতেন। সবচেয়ে বেশি শোনাতেন নাসিরুদ্দীন নামের সিলেটের একজন মাজলুম মুসলমানের কথা। তার একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য মানতের গরু আকিকা দেওয়া, গোহত্যার অভিযোগে হিন্দু সামন্ত রাজার দ্বারা তার শিশুপুত্রটিকে হত্যা করা, হিন্দু রাজার নাসিরুদ্দীনের হাত কেটে ফেলা, তারপর হজরত শাহ জালালের সিলেট আগমন ও গৌড় গোবিন্দ নামের রাজাকে বিতাড়ন ইত্যাদি গল্প শুনতে শুনতে মুহিউদ্দীন ঘুমিয়ে যেত তার মায়ের কোল জড়িয়ে।

মুহিউদ্দীন খানের আম্মা রাবেয়া খাতুন খুবই সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশের মেয়ে ছিলেন। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া ছিল সামান্যই। দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু নিয়মিত পড়াশোনা ও অনবরত অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। খুবই উঁচুস্তরের কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করে নিজের মনন আলোকিত করেছিলেন তিনি; যে আলোর দ্যুতি স্পর্শ করত তার সংসার ও সংসারের মানুষগুলোর কুসুম-কোমল হৃদয়।

মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী হয়ে সবসময় পড়াশোনা করা কিন্তু সহজ কথা নয়। মুহিউদ্দীন খানের আম্মাজান এই কঠিন কাজটিই দিনের পর দিন নিয়মিত করে যেতেন। তখনকার দিনের কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করতেন মুহিউদ্দীন খানের আব্বাজান। এসব পত্রিকা আম্মা নিয়মিত পড়তেন। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে মুহিউদ্দীন খানের আম্মাজানের সবচাইতে প্রিয় ছিল ‘মাসিক নেয়ামত’। ঢাকার আশরাফুল উলুম মাদরাসা থেকে মৌলবী আবদুস সালাম সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো এই পত্রিকা। সাধারণত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর ওয়াজ-নসিহতের বাংলা অনুবাদই অধিক ছাপা হতো। প্রতিটি ওয়াজই ছিল আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-পরিচালনার জন্য এক-একটি রত্নভাণ্ডার। মাওলানা আবদুল হাকীম ও আলী হাসানের বাংলা তাফসির এবং বেহেশতি জেওর, রাহে নাজাত ও মিফতাহুল জান্নাত নামে তিনটি উর্দু গ্রন্থ, মৌলবী নাঈমুদ্দীনের যুবদাতুল মাসায়েল, মাওলানা রুহুল আমীনের মাসআলা ভাণ্ডার, ইমাম গাজালির সৌভাগ্যস্পর্শমণি প্রভৃতি কিতাব ছিল আম্মার নিত্যপাঠ্য। রান্নাঘরের চুলোয় রান্না চড়িয়ে দিয়ে একটি জলচৌকিতে বসে মুহিউদ্দীন খানের আম্মা বই পড়তেন। ওই সামান্য সময়টুকুও নষ্ট হতে দিতেন না।

তার কুরআন তেলাওয়াতের কথা আর কী বলবো! শুনলে এগুলো গল্প মনে হয়!

কুরআনুল কারিমের তেলাওয়াত ছিল তার সবচাইতে প্রিয় কাজ; নেশা যেন। ফজরের নামাজের পর এবং রাতের কাজকর্ম সারা হলে তিনি কুরআন খুলে বসতেন। কুরআনের সাথে ছিল তার আত্মার সম্পর্ক। অনুচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করার পাশাপাশি কুরআনুল কারিমের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়েও তিনি ভাবতেন। তার তেলাওয়াত হৃদয় ছুঁয়ে যেত। পাথর-হৃদয় মানুষের মনও মোমের মতন গলে যেত তার তেলাওয়াত শুনে। তেলাওয়াত করতে করতে অন্য রকম এক তন্ময়তায় হারিয়ে যেতেন তিনি। নিজেও কাঁদতেন, উপস্থিত শ্রোতার আঁখিযুগলও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ত তার তেলাওয়াতের জাদুতে। এমনই ছিল মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে মুহিউদ্দীন খানের আম্মাজানের একান্ত আলাপচারিতা।

যুগে যুগে এমন মায়েদের গর্ভেই তো জন্ম নেয় মুহিউদ্দীন খানদের মতন কিংবদন্তি।

আদবকায়দা থেকে শুরু করে একজন মুসলমানের জীবনযাপনের জন্য প্রাথমিক যে বিষয়গুলো তার জানা জরুরি, মুহিউদ্দীন খান সেগুলো আম্মার পাঠশালা থেকে আয়ত্ত করেছিল।

কিন্তু বড় মানুষ হতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও তো প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের জন্য মুহিউদ্দীনকে খুরশীদ মহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

খুরশীদ মহল প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মুহিউদ্দীন খানদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ছিল; এক মাইলের মতন। অতটা পথ পেরিয়ে স্কুলে যেতে মুহিউদ্দীন খানের ভালো লাগতো না। তা ছাড়া মুহিউদ্দীন খানের শিশুমন আকৃষ্ট করবে এমন কোনো পরিবেশও সেই সময়কার খুরশীদ মহল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিল না। মুহিউদ্দীন খান মাঝেমধ্যেই তাই বেঁকে বসতো; স্কুলে যেতে চাইতো না। এতোটা দূরের স্কুলে কারই-বা রোজ রোজ যেতে ভালো লাগে!

আম্মার কাছে একদিন মুহিউদ্দীন বলেও বসে—‘এতদূরের স্কুলে যেতে আমার খুব কষ্ট হয়।’

আম্মা কিছু বলেন না। চিরুনি দিয়ে মুহিউদ্দীনের এলোমেলো চুল পরিপাটি করতে থাকেন। মুহিউদ্দীন আবার বলে—‘কী হবে স্কুলে পড়ে? এ পড়াটুকু আমি বাড়িতে বসেও পড়তে পারি।’

আম্মা এবার মুখ খোলেন। বলেন—‘না, তা হয় না। স্কুলে গিয়ে পড়লে অনেক বেশি বিদ্যা হবে। অনেক বেশি জানতে পারবে। তা ছাড়া পাস দেওয়ারও তো দরকার আছে?’

মুহিউদ্দীন আম্মার কথা ভালোভাবে বুঝতে চায়। আম্মাকে তাই প্রশ্ন করে—‘কী হবে এত বেশি পড়ে?’

মুহিউদ্দীনের কথা শুনে আম্মা মুচকি হাসেন। বলেন—‘বেশি পড়লে তোমাকে একটা হাতি কিনে দেব।’

বেশি পড়লে আম্মা হাতি কিনে দেবেন বলেছেন। তা হলে যে ভালো করে পড়তেই হয়! মুহিউদ্দীন লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠল। সে ধরেই নিয়েছে—লেখাপড়াটা একটু অগ্রসর হলেই তার একটা হাতি হবে। মনোযোগের সাথে পড়াশোনার পাশাপাশি সে হাতির জন্যও প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। হাতি কী খায়? কীভাবে লালন-পালন করতে হয়? এসব বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল। বয়স্ক কাউকে একটু অন্তরঙ্গভাবে পেলেই হাতি সম্পর্কে নানান তথ্য জানবার

চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। তখন মুহিউদ্দীন বুঝিয়ে বলে—'আমি ভালো একটা পাস দিতে পারলেই আম্মা আমাকে হাতি কিনে দেবেন বলেছেন।'

মুহিউদ্দীনের কথা শুনে তারা মিটিমিটি হাসেন। তাদের সে হাসিতে মুহিউদ্দীনের উৎসাহে কোনো ভাটা পড়ে না। মুহিউদ্দীন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সবাইকে তার হাতি কেনার কথা বলে বেড়াতে থাকে। যাদের সাথে তার বন্ধুত্ব, তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে—তাদেরকে হাতিতে চড়ানো হবে। সাথে সাথে ঘোষণা দিয়েছে—'কেউ দুষ্টুমি করলে তাকে আমার হাতির আশেপাশে ভিড়তে দেব না।'

আর কদিন পরেই মুহিউদ্দীন হাতি কিনবে—তার বন্ধুর সংখ্যা তাই দিনদিন বাড়তে থাকে। বন্ধুরা একটু বাড়তি খাতির দেখাতে থাকে মুহিউদ্দীনের প্রতি।

একদিন কী হলো!

আঠারোবাড়ির জমিদারের হাতি এলো মুহিউদ্দীনদের স্কুলমাঠে। সে হাতি দেখার জন্য শত শত মানুষ জড়ো হলো স্কুলমাঠটির মধ্যিখানে। জড়ো-হওয়া মানুষজনের ভেতর প্রবল উত্তেজনা। আশপাশ থেকে লোকজন আস্ত কলাগাছ কেটে নিয়ে আসছে হাতিকে খাওয়াবে বলে।

সে এক এলাহি কাণ্ড!

হাতি দেখেছে যারা, তারা জানে—সে ইয়া বিশাল এক প্রাণী। প্রথমে দেখলে অনেকের পিলেই চমকে যায়!

জমিদারদের এই হাতিটা ছিল তার চাইতেও বিশাল। গালের দুই পাশ থেকে মুলোর মতন লম্বা দুইটা দাঁত বের হয়ে আছে। ভীষণ ভয়ঙ্কর দেখতে! দূর থেকে হাতিটা একবার দেখেই মুহিউদ্দীনের মন একদম দমে গেল। সে ভাবল—'বাপরে বাপ, এত বড় হাতি নিয়ে আমি রাখবো কোথায়!'

এদিকে আরেক কাণ্ড ঘটে গেল।

মুহিউদ্দীন যে হাতি কিনতে চায়—এককান দু'কান করে সে খবর এরই মধ্যে চাউর হয়ে গেছে। মুহিউদ্দীনকে দেখতে পেয়েই বন্ধুরা হৈ-হৈ করে উঠল। বন্ধুরা মুহিউদ্দীনকে ধরে বসে। বলে :

হাতিটা যখন স্কুলের সামনে এসেই গেছে, দরদাম করে এটাকেই রেখে দে না!

বড়রাও জেনে গেছে মুহিউদ্দীনের হাতি কেনার কথা। তারা মজা করে বলতে লাগলেন—'হাতিটা কিন্তু সত্যিই বিক্রি হবে। তুমি হাতি কিনতে চাও এ খবর পেয়েই বাবুরা স্কুলের সামনে হাতিটা নিয়ে এসেছেন।'

এক মাস্টার বাবু মুহিউদ্দীনকে নিয়ে গেলেন জমিদার কাছারির নায়েব মশাইয়ের সামনে। তেঁতুল গাছতলায় তিনি চেয়ার পেতে বসে ছিলেন। মাস্টার বাবু তাকে জানালেন মুহিউদ্দীনের হাতি কেনার ইচ্ছার কথা। বেশ বয়স্ক নায়েব মশাই

এ কথা শুনে অন্যদের মতো হাসলেন না। উলটো গভীর দৃষ্টিতে মুহিউদ্দীনের চেহারায় কী যেন পাঠ করতে লাগলেন। কিছু সময় তাকিয়ে থাকার পর নায়েব মশাই জিজ্ঞেস করেন—‘কী খোকা, তুমি নাকি হাতি কিনতে চাও!’

মুহিউদ্দীনের দ্বিধাহীন জবাব—‘আমি কিনব না, আমার আম্মা কিনে দেবেন।’

নায়েব মশাই এবার বলেন—‘তোমার আম্মার বুঝি অনেক টাকা!’

মুহিউদ্দীন মাথা নাড়ে। বলে—‘হুম।’

নায়েব মশাই এবার মুহিউদ্দীনকে আরও কাছে ডেকে নেন। বলেন—‘তোমার হাতটা একবার দেখাও তো খোকা!’

মুহিউদ্দীন তাঁর সামনে ডান হাতটা মেলে ধরলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুহিউদ্দীনের হাতটা নাড়াচাড়া করে বললেন—‘বড় হয়ে সত্য সত্যই তুমি একদিন হাতি কিনতে পারবে। তবে এখনই হাতির চিন্তায় লেখাপড়ার ক্ষতি করো না যেন!’

হাতি কেনার যে শখ মুহিউদ্দীনের ভেতর তৈরি হয়েছিল জমিদারের ভয়ঙ্কর হাতি দেখে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সেদিন মুহিউদ্দীন আম্মাকে বলে—‘আম্মা, হাতি না কেনাই ভালো হবে। এত বড় হাতি আমি রাখতে পারব না।’

আম্মা বললেন—‘না, না। তা হয় না। ভালো মতন লেখাপড়া করো। হাতি না হোক, অন্তত একটা মোটরগাড়ি তো তোমাকে কিনে দেব।’

বড় হয়ে মোটরগাড়ির মালিক মুহিউদ্দীন খান ঠিকই হবেন। কিন্তু ততদিনে তার স্নেহময়ী আম্মাজান বেঁচে থাকবেন না। তবে যখনই মুহিউদ্দীন খান তার গাড়িতে উঠে বসবেন তখনই অনুভব করবেন—তার আম্মাজান পাশেই কোথাও আছেন। মুহিউদ্দীন খানকে দেখছেন। আর হাসি হাসি মুখ করে বলছেন—‘কী বাপজান, আমি বলিনি! মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে তোমাকে আমি গাড়ি কিনে দেব।’

মুহিউদ্দীন খানের বয়স তখন কত? বড়জোড় ছয় বছর। দেশে তখন ইংরেজদের শাসন। শাসন কী? শাসনের চাইতে শোষণ বলাই ভালো। জুলুমে অত্যাচারে এ দেশের মানুষের তাজা রক্ত তারা শুষে চলছিল।

ইতিহাস বলে, প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল স্বাধীন রাজ্য; বাদশাহদের শাসনাধীন। ইংরেজ শাসন শুরুর পূর্বে ভারত-ভূমি কখনও পরাধীন ছিল না। দ্রাবিড় আর্য আরব ইরানি পাঠান মোগল তুর্কি অর্থাৎ বহিরাগত যারাই এই ভূমিতে রাজনৈতিক কারণে পা রেখেছে, তারা এ দেশকে আপন করে নিয়েছে। ভারতের আলো গায়ে মেখে এর বাতাসের সাথে মিশে গেছে। এমনকি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণে আসেন, তখন তার কয়েকজন সেনানায়ক এ দেশের জলবায়ু ও ধনসম্পদে মুগ্ধ হয়ে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। এর ব্যতিক্রম হয় অর্থনৈতিক কারণে আগত ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বণিকদের বেলায়।

ভাস্কো ডা গামার ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগিজ বণিকরা এ দেশে একচেটিয়া বাণিজ্য শুরু করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তাদের পথ ধরে এ দেশে আসে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ। সুঁচ হয়ে ঢোকা এই ইংরেজরা এক সময় ফাল হয়ে বেরিয়ে এসে ইতিহাস গড়ে এবং তাদের সে ইতিহাস কেবলই কালিমাখা।

১৫৯৯ সালে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী মাত্র ত্রিশ হাজার পাউন্ডের ক্ষুদ্র মূলধন নিয়ে গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা তখনকার দিনের মুদ্রামান অনুযায়ী ২৫ হাজার ভারতীয় রুপির চেয়েও কম ছিল। এরপরের বছর রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভারতের সাথে তারা বাণিজ্য শুরু করে। ১৬১২ সালে সম্রাট জাহাঙ্গিরের অনুমতিতে তৎকালীন ভারতের প্রধান সমুদ্রবন্দর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তারা। সুরাটে তখন আরও অনেক ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের এক একজনের মূলধন পুরো ইংরেজ কোম্পানির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ছিল। ইংরেজদের দৈন্যদশা দেখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের করুণার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাদের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। এই গুরুত্বহীন, করুণার পাত্র, নামমাত্র মূলধন নিয়ে ব্যবসা করতে আসা ইংরেজরা এক সময় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নিল।

১৭৫৭ সালের ২৩জুন।

পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুরো ভারতবর্ষে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে ইংরেজরা। এদিকে ক্ষমতার লোভে ইংরেজদের দাবি অনুযায়ী ঘুস

সংগ্রহ করার জন্য মির জাফর ও মির কাসিম রাজস্ব বাড়িয়ে দেয়। নবাবের এসব রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতে জমিদাররা প্রান্তিক মুসলিম প্রজা ও রায়তদের উপর খাজনা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। দেশব্যাপী শুরু হয় অরাজকতা। চরম অস্থিতিশীলতায় ছেয়ে যায় দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। একইসাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের বাংলাছাড়া করে ইংরেজরা। তারপর তারাই রেশম, মসলিন, সুতি কাপড়, চিনি, চাল, আফিম ইত্যাদি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাজার কুক্ষিগত করে তারা এসব পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম নামিয়ে দেয়।

ব্যবসায় ইংরেজদের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ছিল আমাদের বঙ্গভূমি। সে সময় বাংলা থেকে কৃষিজ ও প্রাণিজ পণ্য বাদে শুধু মসলিন, মোটা সুতি কাপড়, রেশম ও রেশমি বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করেই বছরে দশ বারো হাজার কোটি টাকা আয় হতো। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, কিশোর মিলিয়ে প্রায় ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতো এই বস্ত্রখাতে। এ ছাড়া ইউরোপে সল্ট পিটার, ইস্ট ইন্ডিজে চাল, জাপানে আফিম, আরব ইরাক ও ইরানে লাল চিনি, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে মরিচ, আদা, দারুচিনি রপ্তানি হতো। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতো শুধু বাংলা অঞ্চল থেকেই।

ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের আগে উৎপাদনকারীরা সরাসরি রপ্তানিকারকদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারতো। রপ্তানিমুখী অবাধ বাণিজ্য ছিল বাংলার অর্থনীতি-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। ইংরেজদের হাতে রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার চলে আসার পর প্রতিযোগিতার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। পণ্যের উৎপাদন খরচের চাইতে বিক্রয়মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে জমিদাররা রাজস্বের পরিমাণ চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমন অবস্থায় বাড়তি কর দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে কৃষক ও কারিগরেরা।

স্বাভাবিক উৎপাদন হার কমে এলে ইংরেজরা হিন্দু জমিদার ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে হিন্দু গোমস্তা, দালাল ও ফড়িয়াদের দ্বারা গ্রামে-গঞ্জে আড়ৎ-গদি প্রতিষ্ঠা করায় এবং অত্যাচার-নিপীড়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করে। এরা থানার দারোগা পরগনার শিকদার ও পাইক-পেয়াদা নামিয়ে বলপূর্বক দাদন নিতে বাধ্য করত এবং চাবুক মেরে জোরপূর্বক কম মূল্যে কাপড়, লবণসহ অন্যান্য দ্রব্য বিক্রি করিয়ে নিত। সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁতীরা তাদের হাতের বৃদ্ধাঙুল কেটে ফেলে। মধ্যাঞ্চলের চাষীরা আসামের অরণ্যের দিকে পালিয়ে যায়। এভাবে জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ইংজেরা এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত নিংড়ে নিতে থাকে।

মুহিউদ্দীন খান সেই ছোট্ট বয়স থেকেই ইংরেজদের এসব অন্যায়-অবিচার দেখে আসছিল। এজন্য ইংরেজদের উপর তার মনে এক ধরনের ঘৃণার জন্ম হয়। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তার অনীহা জন্মে। ফলে আম্মার কথায় স্কুলে আসা-যাওয়া করলেও স্কুলের পড়াশোনায় মনোযোগ নিবিষ্ট করতে পারে না।

ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা তো ছিলই, আরও একটি বিষয় ছোট্ট মুহিউদ্দীনকে স্কুলে পড়ার প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। তখন এ দেশে এক শ্রেণির মানুষ ইংরেজদের গোলামি করতে পারাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করত। ইংরেজ সাহেবদের খুশি করতে তারা তাদের কথাবার্তায় ঘনঘন ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করত; উচ্চারণ ভুলভাল হলেও। নিজেদের সন্তানদের হাফপ্যান্ট-হাফশার্ট পরিয়ে স্কুলে পাঠাতো। এটাকে তারা ভদ্রতা ও কালচার মনে করত। আর যেসব ছেলে লুঙ্গি-কুর্তা-টুপি কিংবা পাজামা-কুর্তা-টুপি পরতো, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অনেকটা করুণা মিশিয়ে।

মুহিউদ্দীন খান স্কুলে যেত পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, টুপি মাথায় দিয়ে। এটা ছিল তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ। কারণ মুহিউদ্দীন খান ছিল এমন পরিবারের সন্তান, যে পরিবার শুরু থেকেই ইংরেজ-শাসনের বিরোধিতা করে আসছিল। প্রায় দু'শো বছরের ইংরেজ প্রভুত্ব কোনো দিনই মেনে নিতে পারেননি যারা, সেই বিপ্লবী আলেম সমাজের একান্ত অনুসারী ছিলেন তার পরিবারের মুরুব্বিরা। চলন-বলন, পোশাকআশাক সবকিছুতেই তারা ইংরেজদের বিপরীত চেতনা লালন করতেন।

মুহিউদ্দীন খান পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরে ইংরেজি স্কুলে যায়। স্কুলে প্রায় দু'-আড়াইশো ছাত্র-ছাত্রী। এত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মুহিউদ্দীন খান আর তার বন্ধু ইয়াসিনই কেবল ব্যতিক্রম। শ্রেণিকক্ষে এবং স্কুল-চত্বরে অন্যদের চোখে এ দুজনকে একদম বেমানান মনে হতো। সবাই তাদেরকে ডাকত 'মুন্সি সাব' বলে। এবং এই 'মুন্সি' সম্বোধনে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রুপের বিষ থাকত, থাকত কিছুটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যও, যা মুহিউদ্দীন খানের কচি মনকে বিষিয়ে তুলত।

মুহিউদ্দীন বাড়িতে জানিয়ে দেয়—আর যাচ্ছে না সে ওই পঁচা স্কুলে।

দ্বিতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার যেদিন ফল বেরুলো তারপর দিনই মুহিউদ্দীন খানের আব্বা ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায়।

পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা ছিল তখনকার দিনে দক্ষিণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই পাঁচবাগ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুক)।

খোদাপ্রেমিক আলেম হওয়ার পাশাপাশি মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক। মানুষের সেবা ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে তিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন।

সেই সময়ে শোষিত ও নানাভাবে পর্যুদস্ত মুসলিমসমাজ মহাজনদের পেতে রাখা সুদের জালে ভয়ঙ্করভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণত মুসলমানরা ছিলেন ভূমিনির্ভর কৃষিজীবী। মহাজনের সুদের জালে আটকা পড়ে এই মানুষগুলোর জীবনে এমনই দুরবস্থা নেমে আসে যে, তারা চোখের পলকে ভূমিহারা হয়ে আসামের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মহাজনরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু আর ঋণগ্রহীতারা ছিল সাধারণ মুসলমান কৃষক। বিপদে-আপদে তারা ঋণের জন্য বিত্তশালী মহাজনদের দ্বারস্থ হতো। কিন্তু মহাজন শুধু শুধু টাকা কর্জ দেবে কেন? তারা তো ব্যবসায়ী। ব্যবসাই তাদের নেশা। ঋণ প্রদানের সময়ও তারা বৈষয়িক চিন্তা করত। কড়া সুদ জড়িয়ে দিত ঋণের সাথে। চক্রবৃদ্ধিহারে সেই সুদ চেপে বসতো গরিব কৃষকের ঘাড়ে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই ঋণ সুদে-আসলে এমন একটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াতো, যা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকত না ঋণগ্রহীতার। শেষপর্যায়ে কৃষিজমি, এমনকি ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত তুলে দিতে হতো হৃদয়হীন মহাজনদের হাতে। এভাবেই অশিক্ষিত গরিব কৃষক দিন দিন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত সুদের অভিশাপে।

সুদে ঋণদান ও দাদন ব্যবসা ছিল সহজে অর্থোপার্জনের খুব আকর্ষণীয় মাধ্যম। ঘরে বসেই দুইগুণ-তিনগুণ অর্থের মালিক বনে যাওয়া যায়! হিন্দু মহাজনদের দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী মুসলমানদের অনেকেই তাই ঝুঁকে পড়ে সুদি লেনদেনের প্রতি।

কিন্তু এটা যে মুসলমানের জন্য বৈধ নয়! আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন! বলেছেন—এটা সরাসরি আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ। সুদ খুবই অপছন্দ তাঁর। কিন্তু ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকাতে বিত্তবান মুসলমানেরা এটা বুঝতো না। এসময়

মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন সুদ ও দাদন ব্যবসার বিরুদ্ধে একজন দুঃসাহসী সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মুসলমান সুদখোরদের তিনি সামাজিকভাবে বর্জন করার ডাক দেন। অপর দিকে ইসলামের বাণী শুনিয়ে গরিব কৃষক সমাজকে উৎসাহ প্রদান করেন—সুদে ঋণ গ্রহণ না করতে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে থাকেন। এরা যে ঘৃণ্য পিশাচ; এদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপনও যে আল্লাহ অপছন্দ করেন—সাধারণ মানুষকে বোঝাতে থাকেন। আর্থিক সংকট দূর করার জন্য তিনি মুসলমান কৃষকদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সঞ্চয় এবং সে সঞ্চয় থেকে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করেন।

মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন সাহেবের একটি কারামতের কথা সে সময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুদি লেনদেনকে যে তিনি ভীষণ ঘৃণার চোখে দেখতেন লোকমুখে প্রসিদ্ধ এই অলৌকিক ঘটনার মধ্যেও তার ছোট্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতি সাধারণ একটি ঘোড়ায় করে চলাফেরা করতেন মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন। প্রায় সারা বছরই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষদের ওয়াজ-নসিহত করে বেড়াতেন। একবার হলো কী, ওয়াজের একপর্যায়ে তিনি বলে ফেললেন—

> বাবারা, তোমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে সুদের মতো ঘৃণ্য মাল খাও; অথচ আমার এই ঘোরাটাকেও তোমরা সুদখোরের বাড়ির কোনো খাদ্য স্পর্শ করাতে পার কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

ওয়াজ-নসিহত করতে গেলে কত কথাই তো মানুষের মুখে এসে যায়। এটাও হয়তো তার কথাচ্ছলে বলে ফেলা কথা হবে। কিন্তু মানুষের কৌতূহলের কী আর শেষ আছে! তারা হুজুরের কথা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিল। এক সুদখোরের বাড়ি থেকে ঘোড়ার প্রিয় খাদ্য ছোলা এনে সামনে ধরলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঘোড়া তা স্পর্শই করল না।

এখনও সে অঞ্চলে গেলে মৌলবী রিয়াজ উদ্দীনের এই অলৌকিক ঘোড়ার কথা লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। পরকালের আজাব-গজবের ভয়াল বর্ণনা দিয়ে মৌলবী সাহেব যখন কান্নাভেজা কণ্ঠে ওয়াজ করতেন তখন তার এই অলৌকিক ঘোড়ার দু'চোখ বেয়েও নাকি অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে দেখা যেত।

মৌলবী রিয়াজ উদ্দীন উপলব্ধি করতেন—ইংরেজ জালেমদের হাত থেকে এ জাতিকে মুক্ত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। মুসলমান সমাজে দীনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে বড় মাদরাসা ছিল নিজ বাড়ির আঙিনায় প্রতিষ্ঠা-করা পাঁচবাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা। সেই সময়টাতেও পাঁচবাগ মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা সাত-আটশোর কম ছিল না। ভাবা যায়!

বিরাট এই প্রতিষ্ঠানের ‘জামাতে দহম’ অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয় স্কুল থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পাস করে আসা মুহিউদ্দীনকে।

ভর্তি হওয়ার পর মুহিউদ্দীন দেখে এত বিরাট মাদরাসার সবচাইতে কমবয়সি ছাত্রটি সে নিজে। তার বয়সি কোনো ছাত্র জামাতে দহমে তো নেইই, পুরো পাঁচবাগ মাদরাসাতেই নেই। ক্লাসের সবাই বয়সে তার বড়। ফলে নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে থাকে। মাদরাসার বিরাট আঙিনার যেখানেই মুহিউদ্দীন যায়, বিরক্তিকর একাকিত্ব তার পিছু নেয়। মন টিকতেই চায় না।

তবে মুহিউদ্দীন খানকে বেশি দিন একা থাকতে হয় না। ইংরেজি স্কুল থেকে তার প্রিয় বন্ধু ইয়াসিনও এসে ভর্তি হয়, একই জামাতে; জামাতে দহম। ইয়াসিন মিয়ার মাদরাসাতে চলে আসাতে মুহিউদ্দীন খানের একাকিত্ব অনেকটাই কেটে যায়। সময়ে সময়ে যে মন খারাপ ভাব তৈরি হতো, তাও আর থাকে না। দুই বন্ধু বিমলানন্দে পাঁচবাগ মাদরাসার পাঠ গ্রহণ করতে থাকে।